بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০১ নভেম্বর, ২০২৪ মোতাবেক ০১ নবুয়্যত, ১৪০৩ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

বনু কুরায়যা যুদ্ধের বিবরণ অব্যাহত রয়েছে। এ সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ হলো, এতে মুসলিম শহীদদের সংখ্যা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এ যুদ্ধে দুইজন মুসলমান শহীদ হয়েছেন, খাল্লাদ বিন সুআয়েদ এবং হযরত মুনযের বিন মুহাম্মদ। আর বনু কুরায়যা গোত্রের নিহত ইহুদীদের সংখ্যা সম্পর্কে বলা হয়েছে, এতে নিহত ইহুদীদের সংখ্যার বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। ইবনে ইসহাক লেখেন, এ সংখ্যা ছিল ছয়শ। অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী এ সংখ্যা ছিল সাতশ। সুহেলী লেখেন, এ সংখ্যা আটশ হতে নয়শ হবে। ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম নিসাঈ এ সংখ্যা চারশ যোদ্ধা লিখেছেন। ইবনে সা'দও এ সংখ্যা ছয়শ হতে সাতশ বর্ণনা করেছেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব বিভিন্ন ইতিহাস ঘেঁটে সে অনুযায়ী তিনি লিখেছেন যে, সা'দ-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেই দিন প্রায় চারশ লোককে হত্যা করা হয়েছিল। আর মহনবী (সা.) সাহাবীদেরকে আদেশ দিয়ে নিহত লোকদের নিজ তত্ত্বাবধানে দাফনের ব্যবস্থা করিয়েছেন। ইসলাম বিরোধীরা এ সংখ্যার ক্ষেত্রে অতিশয়োক্তি করে ইসলামকে এক অত্যাচারী ধর্ম বলে সাব্যস্ত করার চেষ্টা করে থাকে। অথচ তথ্য-উপাত্ত ও সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রতি দৃষ্টি দিলে নির্ভরযোগ্য ইতিহাস অনুযায়ী এ সংখ্যা প্রায় চারশ হয় যারা সবাই ছিল যোদ্ধা। এ কারণেই তাদেরকে একটি বাড়িতে গর্ত করে তাতে দাফনও করা সম্ভবপর হয়।

বর্তমান যুগের একজন আহমদী পণ্ডিত সৈয়্যদ ওয়াক্কাস সাহেবও এ বিষয়ে অনেক গবেষণা করেছেন এবং বেশ ভালো লিখেছেন। তিনি নিজ পুস্তক 'রসূলে আকরাম: ওয়াজুদে হিজায'-এ লেখেন; বনু কুরায়যার নিহতদের সংখ্যা সম্পর্কিত বিতর্কের নিরিখে তিনি কতিপয় প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, যেগুলোর মধ্য থেকে কয়েকটির পেছনে যৌক্তিকতা রয়েছে। প্রথমত সেই মৌলিক নীতিই তিনি গ্রহণ করেছেন যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ নীতি। অর্থাৎ হাদীস হোক বা ইতিহাস– সেগুলোর রেওয়ায়েত দুর্বল ও বানোয়াট হবার সংশয় থেকে মুক্ত নয়। তাই চোখ বন্ধ করে সকল রেওয়ায়েতকে গ্রহণ করে নেওয়া কোনো বিচক্ষণতার কাজ নয়। এছাড়া ছয়শ থেকে নয়শ পুরুষ তাদের স্ত্রী-সন্তানসহ নিহত হওয়া, যাদের সংখ্যা সতর্কতা বজায় রেখে অনুমান করলেও পাঁচ-ছয় হাজারের কম হবে না, তাদের সম্পর্কে এটি বলা যে, তাদেরকে রশিতে বেঁধে মদীনায় নিয়ে আসা, দুটি ঘরে তাদের সবাইকে রাখা, আর তাদের খাদ্য পানীয়ের সরবরাহ করা– যেখানে স্বয়ং মুসলমানরাই ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত অবস্থায় দিনাতিপাত করছিল; (এছাড়া) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেবার জন্য এত বড়ো সংখ্যক মানুষকে নিয়ে যাওয়া, একইসাথে অন্যান্য প্রয়োজন মেটানো, আর কারো পলায়নের চেষ্টা না করা এবং কোনো হইচই না করা, রাতারাতি মদীনার একটি বাজারে সেই ছয়শ লোককে মৃত্যুদণ্ড দেবার জন্য গর্ত খোঁড়া, অথচ সদ্য খোদাইকৃত পরিখাও ছিল; অতঃপর দুই বা তিন ব্যক্তি, অর্থাৎ হযরত আলী ও হযরত যুবায়ের মিলেই তাদের সবাইকে হত্যা করা আর এই উভয়

সাহাবীর কখনো এই ঘটনার উল্লেখ না করা, আর বুখারী ও মুসলিমে নিহতদের সংখ্যার উল্লেখ না করা– এ ধরনেরই আরো কিছু বিষয় এদিকে ইঙ্গিত করে যে, এসব রেওয়ায়েতের দিকে ভিন্নভাবে প্রণিধান করা আবশ্যক। এটি দেখা উচিত যে, এসব রেওয়ায়েত উল্লেখ করতে গিয়ে অতিশয়োক্তি করা হয় নি তো। তিনি লেখেন, গোপনে মহানবী (সা.) ও মুসলমানদের সাথে ইহুদীদের শত্রুতাকে উস্কে দেবার জন্য এসব ঘটনায় পরবর্তী যুগের লোকেরা রং মিশিয়েছে। কেননা বুখারীতে যে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তা হলো, হযরত সা'দ রায় দিয়েছিলেন– 'তুকতালাল মুকাতিলা'। অর্থাৎ তাদের 'মুকাতিলা' বা যারা যুদ্ধ করেছে তাদেরকে হত্যা করা হোক। এখন সাধারণ ঐতিহাসিক ও ব্যাখ্যাকারী এবং জীবনীকারেরা এর অনুবাদ এটি করেছেন যে, প্রত্যেক সেই পুরুষ যে যুদ্ধ করার যোগ্য ছিল তাকে যেন হত্যা করা হয়। বরং তারা এই শব্দটিকে এতটা বিস্তৃত করেছেন যে, যুদ্ধ করার যোগ্য কথার অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে প্রত্যেক সাবালক পুরুষ। আর সাবালক হবার মানও নিজেরা এমনভাবে নির্ধারণ করেছে যেন কিছু লোককে দাঁড় করানো হয়েছে যারা প্রত্যেক পুরুষের প্রাপ্তবয়স্ক হবার লক্ষণকে রীতিমতো পরীক্ষা করত আর ঘোষণা করত যে, এই লোক প্রাপ্তবয়স্ক। এভাবে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অর্থাৎ এতটা অতিশয়োক্তি রয়েছে এতে। কিন্তু যাদের দৃষ্টিতে সংখ্যা স্বল্প ছিল তারা 'মুকাতিলা' শব্দটির অনুবাদ সীমিত রেখেছেন। আর এর অর্থে কেবল সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী পুরুষদের গ্রহণ করেছেন যারা তাদের গবেষণা অনুযায়ী বিশের অধিক নয়। অর্থাৎ তারা অনেক কমিয়ে দিয়েছেন আর এটি কিছুটা গ্রহণযোগ্যতা রাখে।

যাহোক এটি তার নিজস্ব গবেষণা। কিন্তু তার কিছু কথা অবশ্যই যুক্তিযুক্ত আর গবেষণার ক্ষেত্রে সেগুলোকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব বনু কুরায়যার যুদ্ধে নিহত ইহুদীদের সংখ্যার বিষয়ে অমুসলিম ঐতিহাসিকদের আপত্তির উত্তর দিতে গিয়ে লিখেছেন,

বনু কুরায়যার ঘটনা সম্পর্কে কতিপয় অমুসলিম ঐতিহাসিক নিতান্ত কুৎসিতভাবে মহানবী (সা.)-এর ওপর আক্রমণ করেছে আর প্রায় চারশ ইহুদীর সেই মৃত্যুদণ্ডের কারণে তাঁকে (সা.) নাঊযুবিল্লাহ্ একজন অত্যাচারী ও রক্তপাতকারী শাসক হিসেবে উপস্থাপন করেছে। এই আপত্তির ভিত্তি হলো ধর্মীয় বিদ্বেষ; ইসলাম ও ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার বিষয়ে পশ্চিমা ভাবধারায় লালিতপালিত বহু ঐতিহাসিকও তা (তথা সেই বিদ্বেষ) হতে মুক্ত হতে পারে নি। অর্থাৎ কতিপয় মুসলমানও তাদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে গেছে।

এই আপত্তির উত্তরে তিনি লেখেন, প্রথমত এটি স্মরণ রাখা উচিত, বনু কুরায়যা সম্পর্কে যে রায়কে অত্যাচারমূলক বলা হয়ে থাকে তা সা'দ বিন মুআযের রায় ছিল, তা আদৌ মহানবী (সা.)-এর রায় ছিল না। যেহেতু এটি তাঁর (সা.) রায়ই ছিল না– সেক্ষেত্রে এর কারণে তাঁর ওপর আপত্তি করা যেতে পারে না। দ্বিতীয়ত এই রায় উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে মোটেই ভুল ও অত্যাচারমূলক ছিল না। অর্থাৎ যে অবস্থা বিরাজ করছিল, যার বিস্তারিত পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে (সেই প্রেক্ষিতে) মোটেই অন্যায় ছিল না। তৃতীয় কথা হলো, সা'দ রায় ঘোষণার পূর্বে তাঁর (সা.) কাছ থেকে যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন, তার প্রেক্ষিতে তিনি (সা.) অবশ্যই তা বাস্তবায়ন করতে বাধ্য ছিলেন। চতুর্থ বিষয় হলো, যেখানে স্বয়ং অপরাধীরা এই রায় মেনে নিয়েছে এবং এতে আপত্তি করে নি আর এটিকে নিজেদের জন্য ঐশী নিয়তি মনে করেছে, যেমনটি হুয়ী বিন আখতাবের কথা থেকেও প্রতীয়মান হয় যা সে নিহত হবার সময় বলেছিল, এমতাবস্থায় এই বিষয়ে অযথা হস্তক্ষেপ করাটা তাঁর

(সা.) জন্য সমীচীন হতো না। সা'দের রায়ের পর এই বিষয়টির সাথে তাঁর সম্পর্ক কেবল নিজ শাসন ব্যবস্থার অধীনে এই রায়কে উত্তমরূপে বাস্তবায়ন করা। আর বলা হয়েছে, তিনি এটিকে এমনভাবে বাস্তবায়ন করেছেন যেটিকে কৃপা ও দয়ার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। অর্থাৎ যতক্ষণ তারা রায় বাস্তবায়নের পূর্ব পর্যন্ত বন্দি অবস্থায় ছিল তিনি (সা.) তাদের থাকা-খাওয়ার উত্তম ব্যবস্থা করেছেন। যখন তাদের বিরুদ্ধে সা'দের রায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছিল তখন তিনি সেটিকে এমনভাবে বাস্তবায়ন করেছেন যার ফলে অপরাধীদের ন্যূনতম কষ্ট হয়েছিল। অর্থাৎ, প্রথমত তাদের আবেগ-অনুভূতির প্রতি খেয়াল রেখে তিনি (সা.) এই নির্দেশ প্রদান করেন যে, একজন অপরাধীকে হত্যার সময় অন্য অপরাধী যেন সামনে না থাকে। বরং ইতিহাস থেকে জানা যায়, যাদেরকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হতো, তারা ততক্ষণ পর্যন্ত জানতেই পারত না যে তাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নির্দিষ্ট বধ্যভূমিতে পৌঁছতো। এছাড়া যে ব্যক্তি সম্পর্কেই তাঁর (সা.) সমীপে ক্ষমার আবেদন করা হয়েছে তিনি তা সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করেছেন; আর এমন লোকদের কেবল প্রাণভিক্ষাই দেন নি, বরং তাদের স্ত্রী-সন্তান এবং ধনসম্পদ ইত্যাদি সম্পর্কেও নির্দেশ প্রদান করেন, তা যেন তাদেরকে ফেরত দিয়ে দেওয়া হয়। একজন অপরাধীর প্রতি এর চেয়ে বেশি দয়া ও করুণার ব্যবহার আর কী হতে পারে? অতএব বনু কুরায়যার ঘটনা সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর ওপর কোনো আপত্তি তো উত্থাপিত হতে পারেই না, বরং প্রকৃত বিষয় হলো, এই ঘটনা তাঁর (সা.) অনন্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, ব্যবস্থাপনার নৈপুণ্য আর তাঁর প্রকৃতিগত দয়া ও ক্ষমার এক সুস্পষ্ট ও অনন্য প্রমাণ বহন করে।

বাকি রইল মূল সিদ্ধান্তের প্রশ্ন; এ সম্পর্কেও আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, এতে আদৌ কোনো ধরনের অন্যায় ও নিষ্ঠুরতা ছিল না, বরং তা একান্ত ন্যায়ভিত্তিক সিদ্ধান্ত ছিল। এজন্য সর্বপ্রথম আমাদের এটি দেখতে হবে যে, বনু কুরায়যার অপরাধ কী ছিল এবং সেই অপরাধ কোন পরিস্থিতিতে করা হয়েছিল? ইতিহাস থেকে জানা যায়, মহানবী (সা.) যখন প্রথম মদীনায় আগমন করেন তখন মদীনায় ইহুদীদের তিনটি গোত্র বসবাস করত। অর্থাৎ বনু কায়নুকা, বনু নযীর ও বনু কুরায়যা গোত্র। মহানবী (সা.) হিজরতের পর সর্বপ্রথম যে রাজনৈতিক দায়িত্বটি পালন করেন তা হলো, এই তিনটি গোত্রের নেতৃবৃন্দকে ডেকে তাদের সাথে শান্তি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত একটি সন্ধিচুক্তি করেন। এই সন্ধির শর্তাবলি ছিল, মুসলমান ও ইহুদীরা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে মদীনায় বসবাস করবে এবং পরস্পরের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখবে আর একে অপরের শত্রুকে কখনো কোনো প্রকার সাহায্য করবে না কিংবা পরস্পরের শত্রুদের সাথে কোনো প্রকার সংশ্রবও রাখবে না। আর যদি বাইরের এক বা একাধিক গোত্র মদীনার ওপর আক্রমণ করে তখন সম্মিলিতভাবে এর মোকাবিলা করবে। আর যদি চুক্তিভুক্ত কোনো ব্যক্তি বা গোত্র এই সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করে অথবা নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণ হয় তাহলে অপরপক্ষের তাকে দমন করার অধিকার থাকবে। সকল মতভেদ ও ঝগড়াবিবাদ মুহাম্মদ (সা.)-এর সামনে উপস্থাপিত হবে এবং তাঁর (সা.) সিদ্ধান্তই সবার জন্য অবশ্য পালনীয় হবে। তবে প্রত্যেক ব্যক্তি বা জাতির বিষয়ে তাদেরই ধর্ম এবং তাদেরই শরীয়ত অনুযায়ী সিদ্ধান্ত প্রদান অপরিহার্য হবে। এটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে সিদ্ধান্তই হবে তা তাদের ধর্ম ও শরীয়ত অনুযায়ী হবে, অথচ তখন মুসলমানদের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল।

ইহুদীরা এই চুক্তি কীভাবে পালন করেছিল? এর উত্তর হচ্ছে, সর্বপ্রথম বনু কায়নুকা গোত্র চুক্তি ভঙ্গ করে এবং মিত্রতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিন্ন করে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় আর মুসলমান নারীদের অবমাননা করার ঘৃণ্য পন্থা অবলম্বন করে। এরপর মহানবী (সা.)-

এর এই রাষ্ট্রপ্রধানের পদ যা তিনি (সা.) বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর সম্মিলিত চুক্তির মাধ্যমে লাভ করেছিলেন– তা চরম ধৃষ্টতামূলকভাবে লঙ্ঘন করে। কিন্তু (এরপরও) তারা যখন মুসলমানদের কাছে পরাজিত হয় তখন মহানবী (সা.) তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। আর কেবল এটুকু সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন যে, বনু কায়নুকা যেন মদীনার বাইরে অন্য কোথাও গিয়ে বসতি স্থাপন করে, যেন শহরের শান্তি বিঘ্নিত না হয় আর মুসলমানরা যেন এরূপ ঘরের শত্রু বিভীষণের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে; (অর্থাৎ) লুক্কায়িত শত্রু থেকে নিরাপদ থাকে। কাজেই বনু কায়নুকার সদস্যরা শান্তিতে ও নিরাপদে নিজেদের ধনসম্পদ ও স্ত্রী-সন্তানদের সাথে নিয়ে মদীনার বাইরে গিয়ে অন্য স্থানে বসতি স্থাপন করে। কিন্তু এই ঘটনা থেকে ইহুদীদের অপর দুটি গোত্র শিক্ষা গ্রহণ করে নি, বরং তাঁর (সা.) করুণা তাদেরকে আরও দুঃসাহসী করে তোলে। এমনকি কিছু দিন যেতে না যেতেই ইহুদীদের আরেক গোত্র বনু নযীরও মাথাচাড়া দেয় এবং সর্বপ্রথম তাদের একজন নেতা কা'ব বিন আশরাফ চুক্তি ভঙ্গ করে কুরাইশ ও অন্যান্য আরব গোত্রের সাথে হাত মিলিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে আরম্ভ করে। আর আরবের এই হিংস্র পশুদেরকে মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদের বিরুদ্ধে সে ভয়ানকভাবে উসকে দেয় এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে এমন উসকানিমূলক কবিতা পাঠ করে যার ফলে মুসলমানদের জন্য দেশে চরম বিপজ্জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এই দুর্ভাগা এরপর পবিত্র মুসলমান নারীদের নাম উল্লেখ করে নিজের কবিতায় তাদের বিরুদ্ধে অপলাপ করে ও শেষমেশ মহানবী (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। আর মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে যখন এ ব্যক্তি স্বীয় কৃতকর্মের শাস্তি পায় তখন তার গোত্র ঐক্যবদ্ধভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় এবং সেই দিন থেকে বনু নযীর চুক্তি পদদলিত করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে আরম্ভ করে। অবশেষে পুরো গোত্র ঐক্যবদ্ধ হয়ে মহানবী (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করে এবং সিদ্ধান্ত নেয়, যেভাবেই হোক তাঁকে বেঁচে থাকতে দেওয়া হবে না। অথচ তারা চুক্তিবদ্ধ ছিল যে, কেউ যদি অন্যায় করে তাহলে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং সানন্দে তা মেনে নেবে। যাহোক, তাদের হিংস্র ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে মহানবী (সা.) যখন তাদেরকে সতর্ক করেন এবং শাস্তির পথ বেছে নেন, তখন তারা চরম ঔদ্ধত্যের সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যায় এবং এই যুদ্ধে বনু কুরায়যা তাদেরকে সহযোগিতা করে। (বনু কুরায়যা তখন বনু নযীরকে সাহায্যও করেছিল এবং তারাও চুক্তি ভঙ্গ করেছিল।) কিন্তু বনু নযীর পরাজিত হলে মহানবী (সা.) বনু কুরায়যাকে নিঃশর্ত ক্ষমা করে দেন। আর বনু নযীরকেও শান্তিতে ও নিরাপদে মদীনা ছেড়ে চলে যাবার অনুমতি দেন। তবে তাদেরকে তাদের অস্ত্রশস্ত্র সাথে নিয়ে যাবার অনুমতি দেন নি। কিন্তু এ মহানুভবতার প্রতিদান বনু নযীর এভাবে দেয় যে, মদীনার বাইরে গিয়ে তাদের নেতারা সমগ্র আরব চষে বেড়ায় এবং আরবের বিভিন্ন গোত্রকে বিপজ্জনকভাবে উত্তেজিত করে পঙ্গপালের মতো একটি (বিশাল) বাহিনী মদীনার ওপর আক্রমণের জন্য নিয়ে আসে। সবার কাছ থেকে এই দৃঢ় অঙ্গীকার আদায় করে যে, ইসলামকে ধ্বংস না করা পর্যন্ত তারা ফিরে যাবে না।

এমন আশঙ্কাজনক পরিস্থিতিতে, (যার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র বর্ণনা করা হয়েছে,) ইহুদীদের তৃতীয় গোত্র বনু কুরায়যা কী করেছিল? এটি সেই গোত্র ছিল, মহানবী (সা.) বনু নযীর অভিযানের সময় যাদের বিশ্বাসঘাতকতা মার্জনা করে তাদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহসুলভ ব্যবহার করেছিলেন। আর তাদের প্রতি মহানবী (সা.)-এর অপর অনুগ্রহ হলো, মহানবী (সা.)-এর (মদীনায়) হিজরতের পূর্বে তাদেরকে মর্যাদা ও অধিকারের দিক থেকে বনু নযীরের

চাইতে ছোটো জ্ঞান করা হতো। (এই দুটি গোত্র বনু নযীর ও বনু কুরায়যার মধ্যেও পদমর্যাদার তারতম্য ছিল; বনু নযীরের চেয়ে বনু কুরায়যাকে হীন জ্ঞান করা হতো।) বনু কুরায়যার হাতে বনু নযীরের কোনো সদস্য নিহত হলে কিসাস বা প্রতিশোধ স্বরূপ হন্তারককে হত্যা করা হতো। এটি তাদের রীতি ছিল। কিন্তু বনু কুরায়যার কোনো সদস্য বনু নযীরের হাতে নিহত হলে শুধু রক্তপণ পরিশোধ করাই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হতো। তার কাছ থেকে কিছু অর্থ বা রক্তপণ নিয়ে তাকে ছেড়ে দেওয়া হতো। কিন্তু মহানবী (সা.) বনু কুরায়যাকে অন্যান্য নাগরিকের মতো সমান অধিকার দিয়েছিলেন। কিন্তু এতসব মহান অনুগ্রহ সত্ত্বেও বনু কুরায়যা বিশ্বাসঘাতকতা করে। আর বিশ্বাসঘাতকতাও এমন সংকটময় মুহূর্তে করে যার চেয়ে কঠিন সংকটের সময় মুসলমানদের ওপর আর কখনো আসে নি। বনু কায়নুকার দৃষ্টান্ত তাদের সামনে থাকলেও তারা এথেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নি। বনু নযীরের ঘটনা তাদের চোখে সামনেই ঘটেছিল। তারা এর থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করে নি আর করলেও কী করেছে? এটি করেছে যে, নিজেদের সন্ধিচুক্তি উপেক্ষা করে এবং মহানবী (সা.)-এর অনুগ্রহসমূহ ভুলে গিয়ে ঠিক সেই মুহূর্তে যখন তিন হাজার মুসলমান একেবারে নিঃস্ব-নিঃসম্বল ও অসহায় অবস্থায় কাফিরদের দশ-পনেরো হাজার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ও রক্তপিপাসু সেনা কর্তৃক পরিবেষ্টিত অবস্থায় ছিল আর নিজেদের অসহায়ত্ব দেখে তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত ছিল (আহযাবের যুদ্ধের সময়) আর মৃত্যু তাদের চোখের সামনে ভাসছিল– তখন বনু কুরায়যা নিজেদের দুর্গ থেকে বের হয় এবং মুসলিম নারী ও শিশুদেরকে পেছন দিক থেকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয় আর মুসলমানদের সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করে সেই খুনি (কাফির)-দের সাথে যুক্ত হয় যাদের মূল লক্ষ্য ছিল ইসলাম এবং ইসলামের প্রতিষ্ঠাতাকে ধ্বংস করা। হ্যাঁ, ইসলামের সেই প্রতিষ্ঠাতাকে– যাঁর মদীনায় আগমনের পর প্রথম কাজ এটি ছিল যে, তিনি ঐ ইহুদীদেরকে নিজের বন্ধু এবং তাঁর সাথে চুক্তিবদ্ধ বানিয়েছিলেন। এটি গভীরভাবে ভেবে দেখার বিষয়। মহানবী (সা.) মদীনায় আগমন করে এই ইহুদীদেরকে নিজেদের বন্ধু এবং মিত্র বানিয়েছিলেন। আর ইহুদীদের প্রথম কাজ এটি ছিল যে, তারাও তাঁকে (সা.) নিজেদের বন্ধু এবং মিত্র মেনে নিয়েছিল, (তারা মেনেও নিয়েছিল,) আর নিজেদের রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানও স্বীকার করেছিল। এমতাবস্থায় বনু কুরায়যার এরূপ অপকর্ম কেবল চুক্তি ভঙ্গ করা এবং বিশ্বাসঘাতকতাই ছিল না বরং বিপজ্জনক বিদ্রোহের রূপ পরিগ্রহ করেছিল আর বিদ্রোহও এমন ছিল যে, তাদের এই ষড়যন্ত্র যদি সফল হতো তাহলে মুসলমানদের প্রাণ এবং তাদের সম্মান ও সম্ভ্রম আর তাদের ধর্ম নিশ্চিতভাবে নিশ্চিį হয়ে যেত। অতএব বনু কুরায়যা কেবল কোনো একক অপরাধে দোষী ছিল না বরং তারা বিশ্বাসঘাতকতা ও অকৃতজ্ঞতার অপরাধেও দোষী ছিল; চুক্তি লঙ্ঘন, রাষ্ট্রদ্রোহিতার ন্যায় অপরাধ করেছিল, বিদ্রোহ এবং হত্যাচেষ্টার মতো অপরাধ করেছিল আর এইসব অপরাধ তারা এমন এক মুহূর্তে করেছিল যা এক অপরাধকে ভয়াবহ রূপ দিতে পারতো আর জগতের কোনো পক্ষপাতহীন আদালত তাদের এরূপ মামলায় কোনো প্রকার ছাড় দেবার উপাদান খুঁজে পেতে পারে না। এমন পরিস্থিতিতে কোনো আদালতে কোনো ছাড় পাবার সুযোগই নাই।

এমতাবস্থায় তাদেরকে প্রদত্ত শাস্তি ব্যতিরেকে আর কী-ইবা শাস্তি দেওয়া সম্ভব ছিল? একথা সুস্পষ্ট যে, অবস্থা বিবেচনায় কেবল তিনটি শাস্তিই দেওয়া যেতে পারতো। প্রথমত, মদীনাতেই আটক বা নজরবন্দি করা যেতো। দ্বিতীয়ত দেশান্তরিত করা যেভাবে বনু কায়নুকা এবং বনু নযীরের ক্ষেত্রে করা হয়েছিল। তৃতীয়ত, যোদ্ধাদের হত্যা করা আর বাকিদেরকে আটক করা বা নজরবন্দি করা। এখন ন্যায়বিচারের দৃষ্টিতে চিন্তা করে দেখ যে, সেই যুগের

অবস্থা নিরিখে মুসলমানদের জন্য কোন পথ খোলা ছিল? সেই যুগের নিরিখে (এমন) এক শত্রু জাতিকে নিজ শহরে বন্দি করে রাখার একেবারেই প্রশ্ন ওঠে না; কেননা বন্দিদের আবাসন, খাবারদাবারের দায়িত্বও মুসলমানদের ওপরই বর্তাতো যার ব্যয়ভার বহন করার সাধ্য তাদের একেবারেই ছিল না। দ্বিতীয়ত সেই যুগে কোনো জেলখানা ইত্যাদি হতো না আর কয়েদিদের ক্ষেত্রে এই নীতিই ছিল যে, বিজয়ী জাতির লোকদের মাঝে তাদেরকে বণ্টন করে দেওয়া হতো যেক্ষেত্রে কার্যত তারা একেবারেই স্বাধীন থাকতো। এমন অবস্থায় এক চরম বিদ্বেষী এবং ষড়যন্ত্রকারী দলের মদীনায় অবস্থান করা খুবই বিপজ্জনক বিষয় ছিল। বনু কুরায়যার ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত জারি করা হলে তার নিশ্চিত অর্থ হতো নৈরাজ্য সৃষ্টি, বিশৃঙ্খলা করা, ক্ষতিসাধন করা। আর গোপন চক্রান্তের জন্য তারা সেই স্বাধীনতাই লাভ করত যে স্বাধীনতা তারা পূর্বে লাভ করেছিল। এছাড়া তাদের ব্যয়ভার নির্বাহের দায়িত্ব মুসলমানদের ওপর বর্তাতো। অর্থাৎ পূর্বে যদি তারা নিজেদের খেয়ে মুসলমানদের গলা কাটতো, সেক্ষেত্রে [পরবর্তীতে তাদেরকে মুক্ত-স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হলে] তারা খাবারও খেতো মুসলমানদের আর গলাও মুসলমানদেরই কাটতো। তারা ষড়যন্ত্র তো করতই, আর মুসলমানদের ঘরবাড়িতে এবং তাদের সাথে মিলেমিশে বসবাসের কারণে অন্যান্য বিপদাপদের আশঙ্কার কথা বলাই বাহুল্য।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেছেন, এমতাবস্থায় আমি মনে করি না, কোনো বিবেকবান ব্যক্তি এ মত ব্যক্ত করতে পারে যে, বনু কুরায়যাকে সেখানেই বন্দি করে রাখার শাস্তি প্রদান করা যেতে পারে। বাকি রইল দ্বিতীয় সম্ভাব্য শাস্তি অর্থাৎ, দেশান্তরিত করা। এ শাস্তিকে নিঃসন্দেহে সে যুগের দৃষ্টিকোণ থেকে শত্রুর দুষ্কৃতি থেকে সুরক্ষিত থাকার একটি উত্তম পদ্ধতি মনে করা হতো, কিন্তু বনু নযীরের দেশান্তরিত হবার অভিজ্ঞতা থেকে অনুধাবন করা যায় যে, কমপক্ষে ইহুদীদের ক্ষেত্রে এ পন্থা প্রথম পন্থার চেয়ে কোনোভাবেই কম বিপজ্জনক ছিল না। অর্থাৎ ইহুদীদেরকে মদীনা থেকে বাইরে যাবার অনুমতি প্রদান করার অর্থ এছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, এর মাধ্যমে কেবলমাত্র কার্যত ইসলামের যুদ্ধবাজ শত্রুদলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে বরং ইসলামের শত্রুদলের সাথে এরূপ লোকেরা গিয়ে মিলিত হবে যারা নিজেদের চরম উত্তেজনাকর ও শত্রুতামূলক অপপ্রচার এবং গোপন ও চক্রান্তমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রত্যেক ইসলামবিরোধী আন্দোলনের নেতা হবার জন্য ব্যাকুল ছিল। ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে, ইহুদীদের সকল গোত্রের মাঝে বনু কুরায়যা শত্রুতায় সবচেয়ে এগিয়ে ছিল। সুতরাং নিশ্চিতভাবে বনু কুরায়যার দেশান্তরিত হওয়া এর চেয়ে অধিক বিপজ্জনক সাব্যস্ত হতে পারত যা বনু নযীর আহযাবের যুদ্ধ সংঘটিত করার মাধ্যমে মুসলমানদের জন্য সৃষ্টি করেছে। আর মুসলমানরা যদি এরূপ করত তাহলে সে যুগের পরিস্থিতির নিরিখে তাদের এ কাজ আত্মহত্যার নামান্তর হতো। প্রশ্ন হলো, ধরাপৃষ্ঠে এমন কোনো জাতি আছে কি যারা শত্রুকে জীবিত রাখার জন্য নিজেরা আত্মহত্যার পন্থা বেছে নেবে? যদি এমনটি না হয় তাহলে নিশ্চিতভাবে মুসলমানরাও এ কারণে অভিযুক্ত হতে পারে না যে, তারা বনু কুরায়যাকে জীবিত রাখার জন্য নিজেরা আত্মহত্যা কেন করল না?

সুতরাং এ দুই ধরনের শাস্তি প্রদান করা সম্ভব ছিল না আর এ দুটির মাঝে কোনো একটিকে অবলম্বন করা নিজেদেরকে নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবার নামান্তর ছিল। অতএব এ দুটি শাস্তিকে প্রয়োগ না করার পরিস্থিতিতে কেবলমাত্র একটি পদ্ধতি অবলম্বনের সুযোগ ছিল যা কার্যকর করা হয়েছিল। নিঃসন্দেহে সা'দের সিদ্ধান্ত নিজ গণ্ডিতে একটি কঠিন সিদ্ধান্ত ছিল এবং মানব প্রকৃতি বাহ্যত এক ধরনের কষ্ট অনুভব করে থাকে। কিন্তু প্রশ্ন হলো,

এ ছাড়া আর কি অন্য কোনো পথ খোলা ছিল যা অবলম্বন করা যেত? যখন এক ডাক্তার তার রোগীর কোনো অপারেশন– যেমন তার হাত কাটা অথবা পা কেটে ফেলাকে জরুরি মনে করে অথবা দেহ থেকে অঙ্গচ্ছেদ করতে বাধ্য হয়, তখন যে–কোনো সভ্য মানুষের হৃদয়ে এ কষ্ট অনুভূত হওয়া স্বাভাবিক যে, যদি এমনটি না হতো অর্থাৎ যদি পরিস্থিতির কারণে এমনটি করা আবশ্যকীয় না হতো তাহলে ভালো হতো। কিন্তু পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতার কারণে মেনে নিতে হয়। বরং এরূপ পরিস্থিতিতে ডাক্তারের এ কাজকে প্রশংসাযোগ্য আখ্যা দেওয়া হয় যে, সে কম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গকে বিসর্জন দিয়ে অধিক মূল্যবান বস্তুকে রক্ষা করেছে। অনুরূপভাবে বনু কুরায়যা সম্পর্কে সা'দের সিদ্ধান্ত যদিও নিজ গণ্ডিতে স্পর্শকাতর ছিল, কিন্তু তা পরিস্থিতির দাবি অনুসারে এক আবশ্যকীয় পরিণাম ছিল যা ব্যতীত কোনো গত্যন্তর ছিল না। একারণেই, মার্গুলিসের ন্যায় ঐতিহাসিকও– যে একেবারেই ইসলামের শুভাকাঙ্ক্ষী নয়– এ প্রেক্ষিতে সে-ও এ বিষয়টি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, সা'দের সিদ্ধান্ত অবস্থার নিরিখে যথার্থ ছিল যা ব্যতীত কোনো উপায় ছিল না। যেমন মি. মার্গুলিস লিখেছেন, আহযাবের যুদ্ধের আক্রমণের ব্যাপারে মুহাম্মদ (সা.)-এর এ দাবি ছিল যে, তা কেবল ঐশী পরিকল্পনার অধীনে হয়েছিল, তা বনু নযীরেরই উসকানিমূলক কর্মকাণ্ডের ফলাফল ছিল অথবা কমপক্ষে এটি মনে করা হতো যে, তা তাদের চেষ্টার ফল। আর বনু নযীর তারা ছিল যাদের মুহাম্মদ সাহেব (সা.) কেবলমাত্র দেশান্তরিত করাতেই যথেষ্ট মনে করেছিলেন। এখন প্রশ্ন হলো, মুহাম্মদ (সা.) কি বনু কুরায়যাকেও দেশান্তরিত করে নিজেদের বিরুদ্ধে উসকানিমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত লোকদের সংখ্যা এবং শক্তিমত্তায় বৃদ্ধি হতে দিতেন? দ্বিতীয়ত, সেই জাতিকে মদীনায় থাকতে দেওয়া যেতো না যারা এভাবে প্রকাশ্যে আক্রমণকারীদের সঙ্গ দিয়েছে। তাদের দেশান্তর করাটাও নিরাপদ ছিল না, কিন্তু তাদের মদীনায় থাকাটাও কম ভয়ঙ্কর ছিল না। অতএব তাদের হত্যার নির্দেশ দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।

এই মার্গুলিস সাহেব বলেন, এ বিষয়টিও বিশেষভাবে দৃষ্টিপটে রাখা উচিত যে, বনু কুরায়যা কেবল মহানবী (সা.)-এর মিত্র ও তাঁর সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিল না, বরং তারা তাদের প্রাথমিক চুক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে মদীনায় তাঁর (সা.) শাসনকে মেনে নিয়েছিল কিংবা কমপক্ষে তাঁর (সা.) কর্তৃত্ব তারা মেনে নিয়েছিল। অতএব তাদের অবস্থান কেবল একটি বিশ্বাসঘাতক মিত্র অথবা সাধারণ শত্রুর ছিল না বরং তারা অবশ্যই বিদ্রোহী ছিল, তা-ও আবার ভয়ঙ্কর রকমের বিদ্রোহী। আর বিদ্রোহীর শাস্তি, বিশেষ করে যদি তা যুদ্ধের সময় হয়, তবে হত্যা ছাড়া অন্য কিছু বলে মনে করা হতো না। বিদ্রোহীকে যদি চরম শাস্তি দেওয়া না হয় তাহলে সরকার ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়ে, আর দুষ্ট ও নৈরাজ্যবাদীরা এমনভাবে ধৃষ্ট হয়ে ওঠে যা সার্বজনীন শান্তি ও জনকল্যাণের জন্য খুবই ধ্বংসাত্মক সাব্যস্ত হয়। এহেন পরিস্থিতিতে নিশ্চিতভাবে বিদ্রোহীদের প্রতি করুণা করা আসলে দেশ ও দেশের শান্তিকামী মানুষের ওপর নিপীড়নের শামিল। যেমন পর্যন্ত সকল সভ্য সরকারই এ ধরনের বিদ্রোহীদের হত্যার শাস্তিই দিয়ে এসেছে– তা সে পুরুষ হোক কিংবা নারী। আর কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি এতে কখনও কোনো আপত্তি জানায় নি। সুতরাং সা'দের সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণ ন্যায্য এবং একান্ত ন্যায়সম্মত ছিল। মহানবী (সা.) নিজ অঙ্গীকারের দরুন এ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে করুণা প্রদর্শন করতে পারতেন না, কেবল গুটিকতক কিছু ব্যক্তি ব্যতীত যাদের জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টাও করেছেন। কোনো ব্যক্তি যদি ক্ষমা চাইত তাহলে তিনি (সা.) হয়তো ক্ষমা করতে পারতেন কিন্তু পুরো জাতিকে ক্ষমা করতে পারতেন না, কেননা হযরত সা'দ মহানবী (সা.)-এর কাছ

থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। মনে হয়, ইহুদীরা যেহেতু তাঁকে (সা.) বিচারক মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল তাই এ লজ্জায় তারা প্রাণভিক্ষা চাওয়ার কথা খুব একটা বিবেচনা করে নি। আর জানা কথা, আবেদন ছাড়া তিনি (সা.) অনুগ্রহ করতে পারতেন না, কেননা যে বিদ্রোহী নিজের অপরাধের কারণে অনুশোচনাও করে না তাকে এমনিতেই ছেড়ে দিলে তা রাজনৈতিকভাবে ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক পরিণতি সৃষ্টি করতে পারে।

আরেকটি বিষয় মনে রাখা আবশ্যক, মহানবী (সা.) এবং ইহুদীদের মধ্যে যে চুক্তি প্রথম দিকে সংঘটিত হয়েছিল সেটির শর্তাবলির মাঝে এ-ও একটি শর্ত ছিল, ইহুদীদের সম্পর্কে কোনো বিষয়ের মীমাংসার প্রয়োজন দেখা দিলে তা তাদেরই শরীয়ত অনুযায়ী করা হবে। অতএব ইতিহাস থেকে জানা যায়, এই অঙ্গীকারের অধীনে মহানবী (সা.) সর্বদা ইহুদীদের বিষয়ে মূসায়ী শরীয়ত অনুযায়ী সিদ্ধান্ত প্রদান করতেন। বর্তমানে আমরা যদি তওরাতের দিকে দৃষ্টি দেই তবে সেখানে এ ধরনের অপরাধের শাস্তি যা বনু কুরায়যা করেছিল হুবহু তা-ই লেখা দেখি সা'দ বিন মুআয যা বনু কুরায়যার বিষয়ে প্রদান করেছিল।

যেমন বাইবেলে ঐশী নির্দেশ এভাবে লিখিত আছে, "তোমরা যখন কোনো শহর আক্রমণ করতে যাবে তখন প্রথমে সেখানকার লোকদের শান্তির আহ্বান জানাবে। তারা যদি তোমাদের প্রস্তাব স্বীকার করে এবং দরজা খুলে দেয়, তাহলে সেই শহরের সব মানুষ তোমাদের ক্রীতদাসে পরিণত হবে এবং তোমাদের জন্য কাজ করতে বাধ্য হবে। কিন্তু যদি শহরের লোকেরা তোমাদের শান্তির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসে, তাহলে তোমরা অবশ্যই শহরটিকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলবে। তখন তোমরা অবশ্যই সেখানকার পুরুষদের হত্যা করবে; কিন্তু তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য স্ত্রীলোকদের, শিশুদের, গবাদি পশু এবং শহরের যাবতীয় জিনিস নিতে পারো।" এটি দ্বিতীয় বিবরণ-এর বিংশ অধ্যায়ের ১০-১৫ শ্লোকে বিদ্যমান।

ইহুদী শরীয়তের এই নির্দেশ কেবল একটি কাগজে লিপিবদ্ধ এমন আদেশ ছিল না যে, তা কখনোই প্রয়োগ করা হয় নি; বরং বনী ইসরাঈলীরা সর্বদা এটি প্রয়োগ করেছে। ইহুদী বিবাদবিসংবাদ সর্বদা এই নীতির অধীনে মীমাংসা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ লক্ষ করুন,

"মূসাকে দেওয়া সদাপ্রভুর আদেশ অনুযায়ী তারা, অর্থাৎ বনী ইসরাঈল, মিদিয়ানবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ করে সমস্ত পুরুষ লোকদের হত্যা করল। এই নিহতদের ছাড়াও মিদিয়ানের পাঁচজন রাজা- ইবি, রেকম, সূর, হূর এবং রেবাকেও তারা মেরে ফেলল। বিয়োরের ছেলে বিলিয়মকেও তরবারি দ্বারা হত্যা করল। বনী ইসরাঈলীরা মিদিয়ানের নারীদের এবং তাদের ছেলেমেয়েদের বন্দি করল আর তাদের গবাদি পশু, ভেড়া, ছাগপাল এবং সব ধনসম্পদ ও জিনিসপত্র লুট করে নিল। তারা লুট করা সব জিনিসপত্র, সকল বন্দি মানুষ, পশুপাল নিল। তারা বন্দি, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ এবং লুটের জিনিস মূসা, পুরোহিত ইলিয়াসর ও সমস্ত বনী ইসরাঈলীদের কাছে ছাউনিতে, যা মোয়াবের সমভূমি যর্দন নদীর ধারে, যা যিরীহোর উলটা দিকে ছিল, নিয়ে আসল।" গণনাপুস্তকের একত্রিংশ অধ্যায়ের ৭-১২ শ্লোকে উল্লেখ আছে।

যাহোক, হযরত ঈসা (আ.) নিজেও বনী ইসরাঈলীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যদিও তিনি তাঁর জীবদ্দশায় শাসনক্ষমতা লাভ করতে পারেন নি এবং যুদ্ধবিগ্রহেরও সম্মুখীন হন নি, যাতে তাঁর ব্যবহারিক জীবনপন্থা প্রকাশ পেত; কিন্তু তাঁর কিছু কথার মাধ্যমে অনুমান করা যায় যে, নৈরাজ্যকারী এবং দুরাচারী শত্রুদের সম্পর্কে তাঁর মনোভাব কী ছিল।

যেমন, হযরত ঈসা (আ.) নিজ শত্রুদের সম্বোধন করে বলেন, "হে সাপ ও সাপের বাচ্চারা! তোমরা জাহান্নামের শাস্তি থেকে কীভাবে রক্ষা পাবে? অর্থাৎ হে লোকসকল! তোমরা বিষধর সাপের ন্যায় হবার ফলে ধ্বংসের যোগ্য হয়েছ। তবে আমার সেই ক্ষমতা অর্জিত হয় নি যে, তোমাদেরকে শাস্তি দেবো। তোমরা খোদাকে ভয় করো এবং জাহান্নামের শাস্তির কথা চিন্তা করে নিজেদের মন্দ কাজ এবং দুষ্কৃতি থেকে বিরত হও।" হয়তো এ কারণেই হযরত ঈসা (আ.)-এর অনুসারীরা পৃথিবীতে যখন ক্ষমতা লাভ করে তখন তারা হযরত ঈসা (আ.)-এর এই শিক্ষার আলোকে দুষ্কৃতিকারী ও দুরাচারী শত্রুকে সাপ ও বিচ্ছুর মতো ধ্বংসযোগ্য মনে করে। যাকেই পাপাচারী ও দুষ্কৃতিকারী ভেবেছে এবং নিজেদের স্বার্থোদ্ধারে প্রতিবন্ধক পেয়েছে তাকে ধ্বংস করতে কুণ্ঠাবোধ করে নি। এটিই আমরা দেখছি। অতএব খ্রিষ্টান জাতির ইতিহাসে এ ধরনের উদাহরণ ভূরি ভূরি রয়েছে।

সারকথা হলো, হযরত সা'দ (রা.)-র সিদ্ধান্ত যদিও নিজ সত্তায় কঠোর মনে হয় তবে তা ঘুণাক্ষরেও ন্যায়নীতি ও সুবিচারের পরিপন্থি ছিল না। সন্দেহাতীতভাবে ইহুদীদের অপরাধের ধরন এবং মুসলমানদের সুরক্ষার বিষয়– উভয় দিক বিবেচনা করলে তারা এটিরই যোগ্য ছিল যে, (তাদের বিরুদ্ধে) এই সিদ্ধান্তই (গৃহীত) হতো। আবার এই সিদ্ধান্তও ইহুদীদের শরীয়ত অনুযায়ীই ছিল। এছাড়াও সেই প্রাথমিক সন্ধিচুক্তির প্রেক্ষাপটে এমনটি হওয়া আবশ্যক ছিল, কেননা সেটির আলোকে মুসলমানরা এই বিষয়ে বাধ্য ছিল, ইহুদীদের ব্যাপারে তাদের শরীয়ত অনুযায়ী সিদ্ধান্ত প্রদান করবে। তবে যা-ই হোক, এই সিদ্ধান্ত হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)-র ছিল, মহানবী (সা.)-এর ছিল না। হযরত সা'দ (রা)-র কাঁধেই এর সূচনা ও সমাপ্তির দায়িত্বভার বর্তায়। (এই সিদ্ধান্তের সাথে) মহানবী (সা.)-এর যতটুকু সম্পর্ক ছিল তা কেবল রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে যেন তিনি (সা.) এই সিদ্ধান্ত নিজ রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনার অধীনে বাস্তবায়ন করেন। এটি পূর্বেও বলা হয়েছে, তিনি (সা.) (এই সিদ্ধান্তকে) এমনভাবে বাস্তবায়ন করেছেন যা বর্তমান যুগের সভ্য থেকে সভ্যতর এবং পরম দয়ালু সাম্রাজ্যের জন্যও একটি সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত হিসেবে গণ্য হতে পারে।

অতএব এ হলো সেই (আপত্তির) উত্তর যা বর্তমান যুগের আপত্তিকারীরা বা ইসলামের ওপর আপত্তিকারীরা উত্থাপন করে থাকে। এই আপত্তির কারণে আমাদের নিজেদের লোকেরাও প্রভাবিত হয়ে থাকেন (এবং) যুবকদের মনেও প্রশ্ন জাগ্রত হয় যে, কেন বনু কুরায়যাকে হত্যা করা হয়েছিল? এর বৈধতার যুক্তি দিতে গিয়ে এখন কতিপয় প্রশ্ন উত্থাপনকারী বলা আরম্ভ করছে, ফিলিস্তিনবাসীদের বিরুদ্ধে যে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে– এই দৃষ্টিকোণ থেকে সেটিও বৈধ। অথচ সেই যুগের অবস্থার সাথে বর্তমানকালের অবস্থা এবং যে প্রতিশোধ নেওয়া হচ্ছে– এর কোনো যোগসূত্রই নাই। এছাড়া এখানে নারী ও শিশুদেরও নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে।

যাহোক, এ সবকিছুর জন্য মুসলমানরাই দায়ী– যারা নিজেদের স্বার্থের খাতিরে ইসলামের সাথে সম্পর্ক কর্তন করেছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে বিবেকবুদ্ধি দান করুন।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)